Learning Resource

B.Sc. 2nd Semester Honours
Economics
GE 2T: Introductory Macroeconomics

Prof. Supratik Guha

Unit-II: Money

ভূমিকা

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যপক ও সুদূর প্রসারী শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থ ও আবিষ্কারের পূর্বে দ্রব্যের মাধ্যমে বিনিময় কার্য সম্পাদিত হত। কিন্তু এ প্রথায় নানা জটিলতার কারণে মানুষ অর্থ আবিষ্কারের প্রয়োজন অনুভব করে এবং অর্থের আবিষ্কার সকল জটিলতার অবসান ঘটায়। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে অর্থ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এ পাঠে দ্রব্য বিনিময় প্রথা ও তার অসুবিধাসমূহ তুলে ধরে অর্থের ক্রমবিকাশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

দ্রব্য বিনিময় প্রথা

অর্থের আবিষ্কার এবং লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহারের পূর্বে মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লেনদেন অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে সম্পাদন করত। মানুষ তাদের উৎপাদিত উদ্বৃত্ত দ্রব্যের বিনিময়ে তারা যে সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারত না সেসব প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্যের নিকট থেকে সংগ্রহ করত। দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের এরূপ সরাসরি বিনিময়কে 'দ্রব্য' বিনিময় প্রথা বলা হয়। যেমন- কামার তা দা-ছুড়ি-কুড়ালের বিনিময়ে কৃষকের নিকট থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করত, জেলে তার মাছের পরিবর্তে কৃষকের নিকট থেকে ধান-চাল, তাঁতীর নিকট থেকে কাপড় সংগ্রহ করত। এ বিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকার পশ্চাতে দু'টো মৌলিক কারণ বিদ্যান ছিল (১) শ্রম বিভাগের সৃষ্টি এবং (২) সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময় মাধ্যমের অভাব।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার কার্যকর হওয়ার জন্য তিনটি পূর্বশর্ত :

১. একজনের দ্রব্য অন্যজনের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে ;

২. কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের বিনিময়ে নিজের দ্রব্য প্রদানের ইচ্ছা থাকতে হবে ;

৩. অন্যের দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ নিজের ত্যাগকৃত দ্রব্যের উপযোগ পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত উপযোগ ও ত্যাগকৃত উপযোগ সমান।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ

সুদীর্ঘ সময় ব্যপী মানব সমাজে দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকলেও তা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এই বিনিময় অর্থনীতি কেবলমাত্র প্রাচীন জীবনপদ্ধতির জন্য মোটামুটি চলনসই ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানব জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যাপকতর হয়। ফলে দ্রব্য বিনিময় প্রথা তার সাথে তাল মিলিয়ে উঠতে অক্ষম হয়। নিম্নে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো :

১. **অভাবের অসামঞ্জস্যতা :** দ্রব্য বিনিময় প্রথার সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল বিনিময়কারীদের অভাবের অসামঞ্জস্যতা। মনে করুন একজন ক দ্রব্য উৎপাদন করে এবং অন্যজন খ দ্রব্য উৎপাদন করে। এমন হতে পারে যে ক-দ্রব্য উৎপাদনকারীর খ-দ্রব্যের প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে বিনিময় সম্ভব নয়। তাই এমন দু'জনের মধ্যে বিনিময় হবে যাদের কাছে পরস্পরের দ্রব্যের চাহিদা বিদ্যমান। আর এ কাজ কষ্টসাধ্য, সময় সাপেক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব।

২. **দ্রব্যের অবিভাজ্যতা :** বিনিময়কারীদের মধ্যে অভাবের মিল থাকলেও দ্রব্য বিনিময় করা সম্ভব হয় না দ্রব্যের অবিভাজ্যতার কারণে। মনে করি, জনাব জাহাঙ্গীরের ২০ কেজি চালের দরকার। কিন্তু তার কাছে একটি গরু আছে যার বিনিময়ে ৮০ কেজি চাল পাওয়া যায়। তাই ২০ কেজি চালের জন্য গরুটির চার ভাগের এক অংশ দিতে হবে যা অসম্ভব, এক্ষেত্রে বিনিময় অসম্ভব অথবা গরুটির বিনিময়ে ৮০ কেজি চালই নিতে হবে।

৩. **সাধারণ মূল্যমানের অভাব :** এ প্রথায় বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণের কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি ছিল না। তাই একটি দ্রব্যের সাথে অন্যান্য দ্রব্য কি হারে বিনিময় করা হবে তা নির্ধারণ খুব অসুবিধাজনক ছিল। দ্রব্যের পারস্পরিক চাহিদার তীব্রতার উপর বিনিময় হার নির্ভর করত। এই পারস্পরিক চাহিদার তীব্রতা সদা পরিবর্তনীয় ছিল বলে বিনিময় হারও পরিবর্তনীয় ছিল। তাই সঠিক পরিমাপকের অভাবে দ্রব্য বিনিময়ে অসুবিধা হত।

৪. **সঞ্চয়ের অসুবিধা :** দ্রব্য বিনিময় প্রথার যুগে সঞ্চয় করা অসুবিধাজনক ছিল। এমন কি অসম্ভবও ছিল। কেউ সঞ্চয় করতে চাইলে দ্রব্যের আকারে তা করতে হত। পচনশীল দ্রব্য সঞ্চয় করতে চাইলে তার উপযোগ নষ্ট হয়ে যেত, এছাড়া দ্রব্য সামগ্রী মজুত রাখতে সংরক্ষণ ব্যয়ও বেশি পড়ত। এসব কারণে সঞ্চয় করা সম্ভব হত না।

৫. **মূল্য স্থানান্তরের অসুবিধা :** দ্রব্য বিনিময় প্রথায় একস্থান হতে অন্যস্থানে সম্পদের মূল্য স্থানান্তরের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না।

৬. **ঋণ পরিশোধের অসুবিধা :** এ প্রথায় ঋণ গ্রহীতা যে দ্রব্যের আকারে ঋণ গ্রহণ করত সেই একই দ্রব্য দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হত। কিন্তু বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হত না। ফলে ঋণের আদান প্রদান অসুবিধাজনক এবং খুব সীমিত ছিল।

এসব অসুবিধার কারণে দ্রব্য বিনিময় প্রথা সমাজে অচল হয়ে পড়ে এবং মানুষ এ প্রথার বিকল্প মাধ্যম হিসেবে অর্থ আবিষ্কার করে। লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার বিনিময় প্রথার সকল অসুবিধা দূর হয় এবং সামজ জীবনে সূচীত হয় নতুন দিগন্তের। অর্থ আবিষ্কারের ফলে লেনদেন ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে, সঞ্চয়ের ধারা সৃষ্টির মাধ্যমে মূলধন গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছে, অর্থনীতিতে এসেছে গতিশীলতা। মানবজীবনে এসেছে সমৃদ্ধি।

অর্থের ক্রমবিকাশ

অর্থের বর্তমানরূপ মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতার পরিচায়ক। এমন এক সময় ছিল যখন অর্থ বা বিনিময়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। তখন সকলেই নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে সক্ষম ছিল। কালক্রমে মানুষের অভাবের বৈচিত্র এবং শ্রমবিভাগের প্রবর্তন স্বাবলম্বিতা হ্রাস করে। এ প্রথার নানা অসুবিধার কারণে তা সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। ফলে সমাজে চালু হয় সামগ্রী মুদ্রা প্রথা যে ব্যবস্থার বিভিন্ন দ্রব্য (যেমন- কড়ি, পশু, চামড়া, পাথর প্রভৃতি) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু হয়। নানা অসুবিধার কারণে তাও সমাজে বেশিদিন চালু থাকেনি। এরপর শুরু হয় মূল্যবান ধাতুর যুগ। সে সময় মূল্যবান ধাতবপিন্ড (যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ইত্যাদি) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধাতব পিন্ডের ওজন, আকার, গুণাগুণের তারতম্যের কারণে নানা অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে এ প্রথাও টিকেনি। অতঃপর শুরু হয় মূল্যবান ধাতব মুদ্রার যুগ। এ যুগে সোনা, রুপা, তামা ইত্যাদি গলিয়ে বা পিটিয়ে বিভিন্ন ওজন, আকার আকৃতির ও মানের মুদ্রা তৈরি করা হত। সেগুলোর গায়ে রাজা বাদশার ছবি কিংবা অন্যান্য নকসার ছাপ মারা হত। কিন্তু মূল্যবান ধাতুর সীমিত যোগানের কারণে এবং মুদ্রা তৈরী অধিক ব্যয়বহুল বলে এ প্রথাও স্থায়ী হয়নি। এ প্রথার পরে সমাজে অর্থের যে রূপ দেখা দেয় তা আজও টিকে আছে। আর তা হলো কাগজী মুদ্রা। কাগজী মুদ্রা ছিল বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য, বহনযোগ্য এবং উৎকৃষ্ট মুদ্রার সকল গুনাগুন সম্পন্ন। বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র এ মুদ্রা পাকা আসন দখল করে আছে। প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা/বৈদিশিক স্ট্যান্ডার্ড মুদ্রা জমা রেখে তার বিপরীতে কাগজী নোট ছাপায় বর্তমান বিশ্বে অর্থের আরেকটি রুপ দেখা যায় যা আধুনিক ব্যাংক ব্যবসায় ব্যবহৃত তা হলো বিভিন্ন ধরনের মানপত্র (যেমন- চেক, হুন্ডি, ব্যাংক ড্রাফ্ট ইত্যাদি)।

অর্থের সংজ্ঞা

দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় এবং ঋণ পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে যা সর্বজন গ্রাহ্য তাকে অর্থ বলে। অর্থ বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট বাহন। অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্নভাবে অর্থকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ওয়াকারের মতে, "অর্থ যা করে তাই অর্থ"। অনেকের মতে রাষ্ট্র দ্বারা ঘোষিত এবং আইন দ্বারা স্বীকৃত বস্তুই অর্থ। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রচলনকৃত কাগজী ও ধাতব বস্তুর সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে তাকেই একমাত্র অর্থ হিসেবে মেনে নেয়া যায়। কোলেন মতে, "অর্থ এমন একটি বস্তু যা সকলেই সাধারণভাবে দেনা পাওনা মেটাতে এবং দাম পরিশোধ করতে ব্যবহার করে"। সেয়ার্সের মতে, "দেনা পাওনা মেটানোর কাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত কোন বস্তুকে অর্থ বলে"। ক্রাউয়ারের মতে,"যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সংস্কারের বাহন হিসেবে কাজ করে তাই অর্থ"। লর্ড কীনস্ এ মতে,"অর্থ এমন একটি দ্রব্যে যা হস্তান্তর করে ঋণের চুক্তি ও দামের চুক্তি মেটানো যায় এবং যার মাধ্যমে ক্ষমতা সংরক্ষণ করা যায়"।

সুতরাং, যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের উপায় হিসেবে সর্বজন গৃহীত এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকেই অর্থ বলে। অর্থ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে প্রচলিত। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রুপী, জাপানে ইয়েন, জার্মানীতে মার্ক, যুক্তরাজ্যে পাউন্ড স্টার্লিং, যুক্তরাষ্ট্রে ডলার।

অর্থের কার্যাবলী

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে অর্থের প্রচলন হলেও পরবর্তীতে তার কার্যক্রম আরও ব্যাপক হয়ে উঠে। উৎপাদন, ভোগ, বন্টন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণের আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজ অর্থের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতিবিদগণ অর্থের নানা কার্যাবলীর উল্লেখ করেছেন কেহ কেহ অর্থের বিভিন্ন কাজকে নিম্নোক্ত তিনটি দৃষ্টিকোণে দেখেছেন :

(১) প্রাথমিক কার্যাবলী, (২) মাধ্যমিক কার্যাবলী ও (৩) সহায়ক কার্যাবলী। প্রাথমিক কার্যাবলী বলতে অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অর্থের মাধ্যমিক কার্যাবলী হিসেবে মূল্যের ভান্ডার এবং স্থগিত লেনদেনের মান নির্ধারণকে বিবেচনা করেছেন। আর সহায়ক কার্যাবলী তারতম্য, আয় বন্টন ইত্যাদির মধ্যে নিহিত। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বিস্তৃত অর্থে অর্থের কার্যাবলীকে দুই অংশে বিভক্ত করেছেন : (১) স্থিতিশীল কার্যাবলী ও (২) গতিশীল কার্যাবলী। আবার স্থিতিশীল কার্যাবলীকে তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) বাণিজ্যিক কার্যাবলী, ২) সামাজিক কার্যাবলী ও (৩) মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী।

অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলী অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলী নিম্নোক্ত পোকের মাধ্যমে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় :

> "Money is a matter of functions four,
> A medium, a measure, a standard and a store"
>
> অর্থাৎ - "অর্থের কার্য হল চার,
>
> মাধ্যম, পরিমাপক, মান ও ভান্ডার"।

নিম্নে অর্থের বাণিজ্যিক কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচিত হলো :

১. **বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange) :** অর্থের প্রাথমিক ও প্রধান কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেন সম্পন্ন করা। অর্থ সর্বজন গৃহীত বলে এর মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন দ্রব্য বা সেবা যে কোন পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় করা যায়।

২. **মূল্যের পরিমাপক (Measure of Value) :** প্রতিটি দ্রব্য ও সেবার বিনিময় মূল্য অর্থের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। যেমন – এক মণ চালের দাম ৬০০ টাকা, ১ ভরি সোনার দাম ৬৫০০ টাকা, বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণেও অর্থের ভূমিকা রয়েছে।

৩. **স্থগিত লেনদেনের মান (Standand of Deferred Payments) :** ঋণ আদান প্রদানের বা স্থগিত লেন দেনের মান হিসেবে অর্থ ব্যবহৃত হয়। ঋণ দাতা অর্থের আকারে ঋণ দেয় এবং ঋণগ্রহীতা অর্থের আকারে তা পরিশোধ করে। তাই ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ কালে হিসাবগত কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। ধারে ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য ও অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এতে ক্রেতা বিক্রেতার আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

৪. **সঞ্চয়ের ভান্ডার (Store of Value) :** অর্থ সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। মানুষ তার উদ্বৃত্ত দ্রব্য সামগ্রী সঞ্চয় করতে চায়। কিন্তু জায়গা ও দ্রব্যের স্থায়ীত্বের অভাবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঝুঁকি বহুল বলে মানুষ দ্রব্যাদি সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। কিন্তু অর্থের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ সহজে এবং নিরাপদে সঞ্চয় করা যায়। ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যায়। সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে অর্থ মূলধন হিসাবে সহায়তা করে।

৫. **মূল্য স্থানান্তরের বাহন (Means of Value Transfer) :** অর্থ সব ধরনের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য স্থানান্তরের বাহন হিসেবে কাজ করে। মানুষ তার সম্পত্তি একসাথে বিক্রি করে যে অর্থ পায় তা দিয়ে অন্যস্থানে তা ক্রয় করতে পারে। যা দ্রব্য বিনিময় প্রথায় অসম্ভব।

৬. **ঋণের ভিত্তি (Base of Credit) :** বর্তমানকালে ব্যবসায়িক লেনদেনের অধিকাংশ বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রের (চেক, ব্যাংক ড্রাফ্ট, বিনিময়পত্র ইত্যাদি) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র ইস্যু করে এবং ঋণপত্রধারীদের অর্থের চাহিদা পূরণ করে।

৭. **তারল্যের মান (Standerd of Liquidity) :** অর্থের সাহায্যে যে কোন দ্রব্য যে কোন সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। সুতরাং এটি সর্বপেক্ষা তরল সম্পদরূপে বিবেচিত। অর্থের এ তারল্য গুণের জন্য দ্রব্য সামগ্রীকে যেমন সহজে অর্থে রূপান্তর করা যায়, তেমনি অর্থকেও দ্রব্যসামগ্রীতে পরিণত করা যায়।

৮. **তৃপ্তিবৃদ্ধির উপায় (Means of Maximizing Satisfaction) :** ভোক্তার প্রধান উদ্দেশ্য ক্রীত দ্রব্য থেকে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা। এ উদ্দেশ্যে ভোক্তা এমনভাবে তার নির্দিষ্ট আয় বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ব্যয় করে যাতে প্রত্যেকটি দ্রব্যর উপর ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হয়।

অর্থের সামাজিক কার্যাবলী (Social Functions of Money)

সামাজিক জীবনে অর্থ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে বাণিজ্যিক ধরনের নয় এমন অনেক লেনদেনের বাহন হিসেবে কাজ করে অর্থ। যেমন – উপহার, সাহায্য, জরিমানা, কর প্রদান ইত্যাদি লেনদেনে অর্থ ব্যবহৃত হয়। মানুষের সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

অর্থের মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী (Psychological Functions of Money)

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে মানুষ তার সম্পদের একাংশ সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় থাকতে চায়। অর্থই সবচেয়ে তরল সম্পদ হিসেবে তার এরূপ মনোবৃত্তিকে পূরণ করে। মানুষ ভবিষ্যতের বিপদ আপদ এবং অনিশ্চয়তা মোকাবেলার জন্য নগদ অর্থ হাতে রাখে এবং নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

অন্যান্য বা গতিশীল কার্যাবলী :

অর্থ উৎপাদন, ভোগ, সঞ্চয়, বন্টন, ব্যবসা বাণিজ্য, মূল্যের পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক অর্থনীতিতে অর্থই সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রধান চালিকা শক্তি। বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম এবং মূল্যের পরিমাপক হিসেবে অর্থ বিনিময়ে ব্যবস্থাকে সহজ ও গতিশীল করেছে। সঞ্চয়ের বাহন এবং ঋণ আদান প্রদানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। অর্থের ব্যবহার জাতীয় আয় বন্টনকে সহজ করেছে। অর্থের ব্যবহার আভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য বিস্তৃত করেছে। এক কথায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে শক্তিশালী উপাদান হলো অর্থ।

অর্থের শ্রেণীভেদ (clasification of Money)

অর্থকে প্রথমতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন – হিসাবী অর্থ ও প্রকৃত অর্থ।

১. **হিসাবী অর্থ :** যে অর্থ বা মুদ্রার নামে জিনিসপত্রের দাম লেনদেন ও হিসাব নিকাশ রাখা হয় তাকে হিসাবী অর্থ বলা হয়। যেমন বাংলাদেশে টাকা, ভারতের রূপী, যুক্তরাষ্ট্রে ডলারের মাধ্যমে হিসাব নিকাশ ও বিনিময় চলে।

২. **প্রকৃত অর্থ :** যে অর্থের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ক্রয় বিক্রয় ও দেনা পাওনা সম্পন্ন হয় তাকে প্রকৃত অর্থ বলে। যেমন – বাংলাদেশের বিভিন্ন মানের ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট।

প্রকৃত অর্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – ধাতব মুদ্রা ও কাগজী অর্থ (নোট)।

ক) **ধাতব মুদ্রা :** যে প্রকৃত অর্থ ধাতু দ্বারা তৈরি তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। যেমন – বাংলাদেশের বিভিন্ন মানের ধাতব মুদ্রাগুলো। ধাতব মুদ্রাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয় ১) প্রামানিক ধাতব মুদ্রা ও ২) প্রতীক ধাতব মুদ্রা।

১) **প্রামাণিক মুদ্রা :** যে ধাতব মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য এবং অন্তর্নিহিত মূল্য সমান তাকে প্রামাণিক ধাতব মুদ্রা বলে। প্রামাণিক মুদ্রা গলিয়ে বিক্রি করলে মুদ্রার সমপরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়। যেমন – বৃটিশ আমলের ১ টাকার মুদ্রা।

২) **প্রতীক মুদ্রা :** যে ধাতব মুদ্রার দৃশ্যমান মূল্য তার অন্তর্নিহিত বা ধাতব মূল্যের চেয়ে বেশি তাকে প্রতীক মুদ্রা বলে। যেমন – বাংলাদেশের বিভিন্নমানের ধাতব মুদ্রাগুলো।

খ) **কাগজী অর্থ :** কাগজ দিয়ে যে অর্থ তৈরি তাকে কাগজী অর্থ বা কাগজী নোট বলে। দেশের সরকার তার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন মানের কাগজী নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে। কাগজী নোট ছাড়ানের ফেছনে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা/রূপা/বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে হয়। বাংলাদেশের ৫ টাকা, ১০ টাকা, ৫০০ টাকার নোট সমূহ কাগজী অর্থ।

কাগজী অর্থকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন – ১) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী অর্থ, ২) পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ ও ৩) অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ।

১) **প্রতিনিধিত্ব মূলক কাগজী অর্থ :** সমমূল্যের সোনা, রূপা বা বৈদিশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রেখে যে কাগজী নোটের প্রচলন করা হয় তাকে প্রতিনিধিত্ব মূলক কাগজী অর্থ বলে।

২) **পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ :** যে কাগজী নোটের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সোনা, রূপা বা বৈদেশিক মুদ্রা বাহককে দিতে বাধ্য থাকে তাকে পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ বলে। যেমন বাংলাদেশের ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ১০০ টাকা ও ৫০০ টাকার নোট সমূহ।

৩) **অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ :** যে কাগজী নোটের বিনিময়ে কোন ধাতব মুদ্রা, সোনা রূপা বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকে না এবং বাহককে প্রদান করে না তাকে অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ বলে। শুধু সরকারী আদেশেই এরকম নোট চালু থাকে। বাংলাদেশের ১ টাকা ও ২ টাকার নোট।

আইনগত দিক থেকে অর্থকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ১) বিহিত অর্থ ও ২) ঐচ্ছিক অর্থ।

১) **বিহিত অর্থ :** যে অর্থের গ্রহণযোগ্যতা আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং জনগণ তা গ্রহণ করতে বাধ্য, তাকে বিহিত অর্থ বলে। বিহিত অর্থকে সরকারী অর্থও বলা হয়। বিহিত অর্থ আবার দু'রকম : ক) সসীম বিহিত অর্থ ও খ) অসীম বিহিত অর্থ।

ক) **সসীম বিহিত অর্থ :** যে বিহিত অর্থ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি দেনা পরিশোধে গ্রহীতার আপত্তি থাকতে পারে তাকে সসীম বিহিত অর্থ বলে। যেমন – ১ টাকা, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ১০ পয়সা ও ৫ পয়সার মুদ্রা।

খ) **অসীম বিহিত অর্থ :** যে বিহিত অর্থ দ্বারা যে কোন পরিমাণ লেনদেন সম্পন্ন করা যায় এবং পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য তাকে অসীম বিহিত অর্থ বলে। যেমন – বাংলাদেশের ৫০০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০ টাকা, ২০ টাকা, ১০ টাকা, ৫ টাকার নোট সমূহ।

২) **ঐচ্ছিক মুদ্রা :** যে মুদ্রা গ্রহণ করার আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই বরং তা গ্রহণ করা গ্রহীতার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে তাকে ঐচ্ছিক মুদ্রা বলে। যেমন – চেক, ড্রাফ্‌ট, পে-অর্ডার, হুন্ডি, ট্রেজারী বিল ইত্যাদি।

উপরোক্ত শ্রেণীভেদ ছাড়া এ অর্থকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীভেদ করা যায় :

১) **আদিষ্ট অর্থ :** যে অর্থের কোন বস্তুগত মূল্য নেই এবং অন্য কোন ধাতু বা মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যায় না অথচ সরকারী নির্দেশে বিহিত অর্থ হিসেবে চালু আছে, তাকে আদিষ্ট অর্থ বলে। যেমন- ১ টাকার নোট।

২) **পরিচালিত মুদ্রা :** বাজারে দামস্তর স্থিতিশীল রাখা, পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সরকার মাঝে মাঝে বাজারে যে অর্থ চালু করে তাকে পরিচালিত মুদ্রা বলে। এটি পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় দুই-ই হতে পারে।

৩) **প্রায় মুদ্রা :** যে সকল সম্পদকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় না, তবে প্রয়োজনে অতি সহজে তরল মুদ্রায় প্রকাশ করা যায়, তাদেরকে প্রায় মুদ্রা বলে। যেমন- প্রাইজ বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ট্রেজারী বিল ইত্যাদি।

গ) **সরকারী অর্থ :** যে সকল মুদ্রা অল্প পরিমাণের এবং খুচরা ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাজারে চালু থাকে তাকে সরকারী মুদ্রা বলে। যেমন – বাংলাদেশের ১ টাকার নোটসহ বিভিন্ন মানের ধাতব মুদ্রাসমূহ।

নিচের চার্টের মাধ্যমে মুদ্রার শ্রেণীভেদ দেখান যায় :

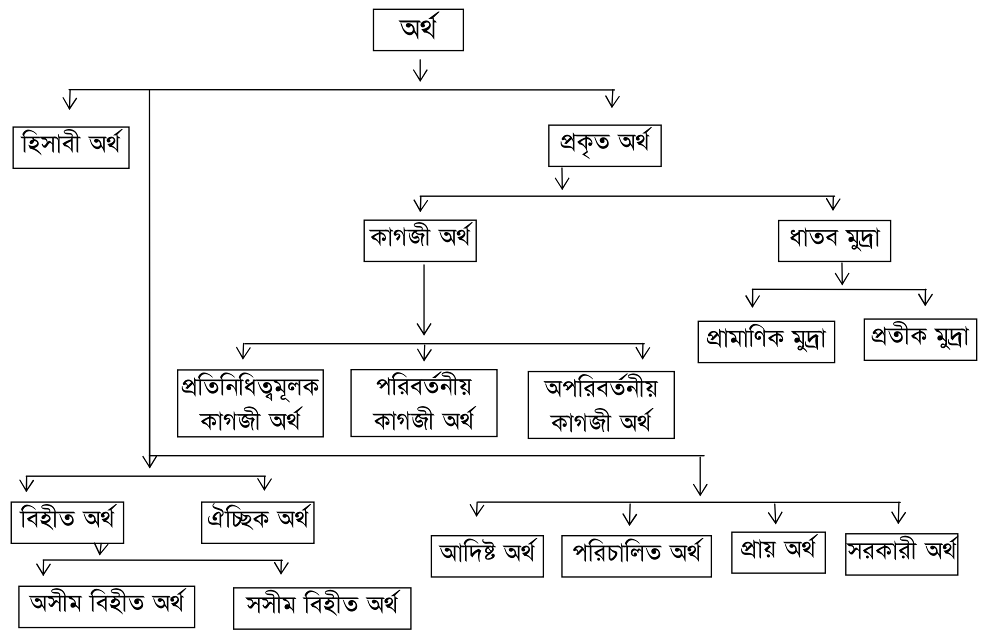

অর্থের চাহিদা (Demand for Money)

অর্থের নিজস্ব কোন চাহিদা নেই। ইহা বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে বলে মানুষ তা নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায়। আর এই ধরে রাখার প্রবণতাই তার চাহিদা নির্দেশ করে।

অর্থের চাহিদা সম্পর্কীয় অনেক তত্ত্ব ও গবেষণালব্দ ফলাফল রয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীনস্ এর তত্ত্বটিই আলোচনা করব। তার এই তত্ত্বটি 'নগদ পছন্দ তত্ত্ব' নামে খ্যাত। তার মতে, মানুষ নিম্নোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় :

১. **লেনদেন উদ্দেশ্য :** মানুষ দৈনন্দিন লেনদেন মিটানোর জন্য কিছু নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়, কেননা আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে অর্থ ধরে রাখাই হলো লেনদেনের উদ্দেশ্যজনীত অর্থের চাহিদা। এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদার পরিমাণ ব্যক্তিবর্গের লেনদেনের পরিমাণ ব্যয় অভ্যাস, আয় ব্যয়ের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধান, আয়স্তর ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

২. **সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য :** সাবধানতার কারণে মানুষ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়। কোন জরুরী অবস্থা দেনা দিলে তা মোকাবেলার জন্য এ ধরনের অর্থ হাতে রাখে। এ উদ্দেশ্যে অর্থ হাতে ধরে রাখাকে বলা হয় সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (Precautionary demand for Money)। এ উদ্দেশ্য অর্থের চাহিদা আয়স্তর, তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ অনিশ্চয়তার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

মানুষের ব্যয় আচরণ, আয় প্রাপ্তির ব্যবধান ইত্যাদি স্থির অবস্থায় লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা মূলতঃ আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল। আর আয়স্তরের সাথে এদের সম্পর্ক ধনাত্বক। অর্থাৎ আয়স্তর বেশি হলে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা বেশি এবং আয়স্তর কম হলে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা কম হয়। বিষয়টিকে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে লেখা যায়–

$M_1 = L_1(y) = kY$ যেখানে M_1 = লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা, L_1 = তারল্য অপেক্ষক, Y = আয়স্তর, k = M_1 এবং y এর মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক প্রকাশকারী একটি ধনাত্বক স্থির রাশি। উপরোক্ত সমীকরণটি চিত্র 1 এর মাধ্যমে দেখানো যায়। চিত্রে ভূমি অক্ষে আয়ের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে লেনদেনও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা দেখান হলো। দেখা যাচ্ছে আয় স্তর (y) বৃদ্ধির ফলে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (M_1) বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র 1

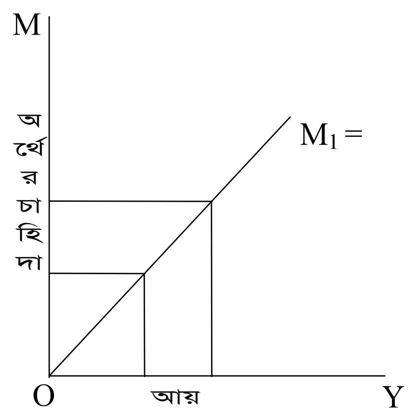

৩) **ফটকা উদ্দেশ্য :** বাজারের গতিবিধির সুযোগ গ্রহণ করে ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা লাভের আশায় মানুষ নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায়। এ উদ্দেশ্যে অর্থ হাতে রাখাকে ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (Speculative demand for money) বলে। এ উদ্দেশ্যে হাতে রাখা অর্থের পরিমাণ সুদের হারের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সুদের বেশি হলে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা কম এবং সুদের হার কম হলে অর্থের চাহিদা বেশী হয়। সমীকরণ সাহায্যে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা নিম্নরূপে দেখান যায় :

$M_2 = L_2(i)$ যেখানে M_2 = অর্থের ফটকা উদ্দেশ্য জনিত চাহিদা, L_2 = তারল্য অপেক্ষক i = সুদের হার। উপরোক্ত সম্পর্কটি চিত্র 2 এর মাধ্যমে দেখান হলো :

চিত্র 2

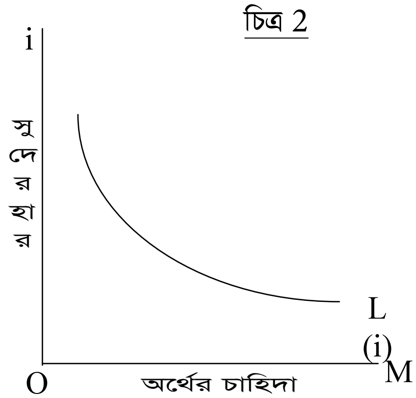

চিত্রে ভূমি অক্ষে অর্থের ফটকা উদ্দেশ্য জনিত চাহিদা এবং লম্ব অক্ষে সুদের হার প্রদর্শিত হলো। L_2 (i) রেখাটি ফটকা উদ্দেশ্যজনিত অর্থের চাহিদা রেখা যা ডানদিকে নিম্নগামী। এর অর্থ সুদের হারের সাথে এ উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদার সম্পর্ক বিপরীত।

অর্থের সামগ্রীক চাহিদাকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করতে পারি : $M = M_1 + M_2 = L_1(y) + L_2(i)$। এখানে M হলো অর্থের সামগ্রীক চাহিদার পরিমাণ। এ চাহিদা অপেক্ষকের একটি দিক হচ্ছে সুদের হারের সাথে অর্থের চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং নিম্নতম সুদের হারে এ স্থিতিস্থাপকতা অসীম হতে পারে। ফলে অর্থের চাহিদা রেখাটি (LP) ডানদিকে নিম্নগামী এবং ন্যূনতম সুদের হারে তা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল (চিত্র 3)। এ সমান্তরাল অঞ্চলটিকে বলা হয় তারল্য ফাঁদ অঞ্চল।

চিত্র 3

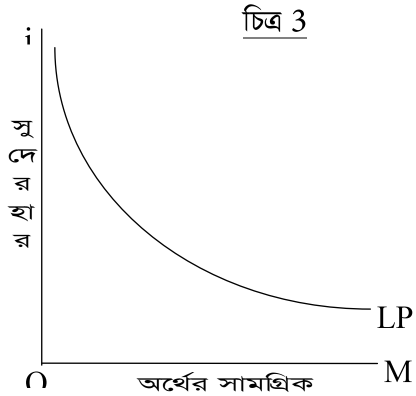

অর্থের যোগান (Supply of Money)

অর্থের যোগান বলতে বিহিত মুদ্রা, ব্যাংক মুদ্রা ও প্রায় মুদ্রার সমষ্টিকে বুঝায়। কারো কারো মতে অর্থের যোগান বলতে জনগণের নিকট রক্ষিত অর্থ, ব্যাংকে রক্ষিত চাহিদা আমানত ও মেয়াদী আমানতের সমষ্টিকে বুঝায়। সমাজের মোট অর্থের যোগান বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত অর্থ, সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত অর্থ ও বিভিন্ন ধরনের আমানতকে বুঝায়।

অর্থের যোগানের উপাদান সমূহ :

১) **বিহিত মুদ্রা :** অর্থের যোগানের প্রধান উপাদান হলো বিহিত মুদ্রা। দেশের অভ্যন্তরে সকল লেন দেনের কাজে ব্যবহারের জন্য যে মুদ্রা সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত এবং যা সকলেই গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে, তাকে বিহিত মুদ্রা বলে। দেশের অর্থের যোগানের বৃহতম অংশ এ বিহিত মুদ্রা।

২) **ব্যাংক মুদ্রা :** ব্যাংকের প্রকৃত আমানত ও সৃষ্ট আমানতের ক্ষেত্রে আমানতকারীগণ চেকের মাধ্যমে অর্থ উঠাতে পারেন। এ চেক নগদ অর্থের মতই তরল। ব্যাংক মুদ্রা অর্থের যোগানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩) **প্রায় মুদ্রা :** অর্থের যোগানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হলো প্রায় মুদ্রা। বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র (বিনিময় বিল, সরকারী বন্ড, ট্রেজারী বিল, পোষ্টাল ওর্ডার, প্রাইজবন্ড, সেভিংস সার্টিফিকেট ইত্যাদি) সহজেই নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। এগুলো অর্থ না হলে অর্থের মত।

উপরোক্ত উপাদানসমূহের সমন্বয়ই হচ্ছে অর্থের যোগান। এ উপাদান সমূহেরহ্রাস বৃদ্ধির ফলে অর্থের যোগানেরহ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের যোগান স্থির বিবেচনা করা হয়।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity theory of Money)

অর্থের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন এবং অতি পরিচিত তত্ত্বটি হচ্ছে অর্থের পরিমাণতত্ত্ব যার প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক আরভিং ফিশার। অর্থের মূল্য নির্ভর করে অর্থের ক্রয় ক্ষমতার উপর। আবার ক্রয় ক্ষমতা নির্ভর করে দামস্তরের উপর। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে অর্থের পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তর সে হারে একই দিকে পরিবর্তিত হয় ফলে অর্থের মূল্য একই হারে বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং অর্থের মূল্য তার যোগান বা পরিমাণ এর উপর নির্ভর করছে। এটাই ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য।

ফিশারের মতে, সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর মত অর্থের মূল্য ও তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে স্বল্পকালীন সময়ে মোট উৎপাদন ও সেবার পরিমাণ স্থির থাকে বলে অর্থের চাহিদার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। তাই অর্থের যোগানের হ্রাস বৃদ্ধির দরুন অর্থের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি পায়।

অর্থের চাহিদা : দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অর্থের চাহিদা হয়। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাকে অর্থের চাহিদা বলে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার দামের উপর অর্থের চাহিদা নির্ভর করে। মনে করি, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ T এবং দামস্তর P। এমতাবস্থায় অর্থের মোট চাহিদা $= PT$।

অর্থের যোগান : একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রচলিত মোট আয়ের পরিমাণকে অর্থের যোগান বলে। অর্থের যোগানের মধ্যে বিহিত মুদ্রা ও ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বা ঐচ্ছিক মূদ্রা (যেমন – চেক, ড্রাফ্ট বিনিময় বিল ইত্যাদি) অর্ন্তভুক্ত। অর্থের প্রচলন গতির উপর অর্থের যোগানের পরিমাণ নির্ভর করে। কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে এক একক অর্থ যতবার হাত বদলায় তা-ই হলো অর্থের প্রচলন গতি। মোট অর্থের পরিমাণ এবং এর প্রচলন গতির গুণফলের সমষ্টি হলো ঐ নিদিষ্ট সময়ে অর্থের যোগান। মনে করি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ M এবং এর প্রচলন গতি V। আবার ঐ সময়ে ঐচ্ছিক মুদ্রার পরিমান M' এবং এর প্রচলন গতি V' । এমতাবস্থায় অর্থের মোট যোগান হবে বিহিত মুদ্রার পরিমাণ ও ঐচ্ছিক মুদ্রার পরিমাণকে স্বস্ব প্রচলন গতির গুণফলের সমষ্টি। অর্থাৎ অর্থের যোগান $= MV+M'V'$

ফিশারের মতে অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান পরস্পর সমান।

অর্থাৎ $PT = MV + M'V'$ (ফিলারের সমীকরণ)

$$\therefore P = \frac{MU + MV}{T}$$

ফিশারের মতে স্বল্পকালীন সময়ে T, V, M' অপরিবর্তিত থাকে। এমতাবস্থায় M ও M' এর পরিবর্তনের কারণে দামস্তর (P) একই হারে একই দিকে পরিবর্তিত হয়। যেমন- M এবং M' এর পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দামস্তর দ্বিগুণ হবে এবং অর্থের মূল্য অর্ধেক হবে। আবার M ও M' এর পরিমাণ অর্ধেক হলে দামস্তর অর্ধেক হবে এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হবে। নিচে গাণিতিক উদাহরণের সাহয্যে তা ব্যাখ্যা করা হলো :-

মনে করি, $M =$ ২০০ টাকা, $M' =$ ১০০ টাকা

$V =$ ৫, $V' =$ ২, $T =$ ৫০০ একক

$$\therefore P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{২০০০ \times ৫ + ১০০০ \times ২}{৫০০}$$ টাকা (একক প্রতি)

$$= \frac{১২০০}{৫০০}$$ টাকা (একক প্রতি) = = ১২০ টাকা (একক প্রতি)

এখন মনে করি, V, V' ও T স্থির থেকে M ও M' দ্বিগুণ হয়ে গেল, এমতাবস্থায় দামস্তরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$= \frac{৪০০০ \times ৫ + ২০০০ \times ২}{৫০০}$$ টাকা (একক প্রতি)

$$= \frac{২৪০০}{৫০০}$$ টাকা (একক প্রতি) = ২৪০ টাকা (একক প্রতি)

সুতরাং অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ায় দামস্তর দ্বিগুণ হয়ে গেল। ফলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে অর্থের পরিমাণ অর্থাৎ M ও M' অর্ধেক হলে P এর মান অর্ধেক হয়ে যাবে এবং অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটির জ্যামিতিক বিশ্লেষণ চিত্র 4 এ দেয়া হলো।

চিত্র 4

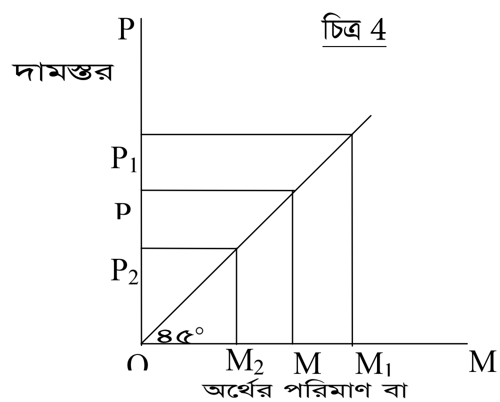

চিত্রে ভূমি অক্ষে অর্থের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর প্রমাণ করা হলো। অর্থের পরিমাণ OM হলে দামস্তর হবে OP। অর্থের পরিমাণ OM থেকে বৃদ্ধি পেয়ে $OM_1(OM_1 = 2OM)$ হওয়ায় দামস্তর বেড়ে হলো $OP_1(OP_1 = 2OP)$। আবার অর্থের পরিমাণ OM থেকে কমে $OM_2(OM_2 = {}^2/_1 OM)$ হলে দামস্তর কমে $OP_2(OP_2 = {}^1/_2 OP)$ হলো। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যে হারে বাড়ে দামস্তর একই হারে বাড়ে এবং বিপরীতক্রম। ফলে অর্থের মূল্য তখনই হারে বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়। চিত্রে OA ৪৫° রেখা হওয়ায় অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে, সমানুপাতিক সম্পর্ক নির্দেশ করে।

সমালোচনা :

১. ফিশারের তত্ত্বে অনুমান করা হয়েছে ক্রয় বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ (T), বিহিত মুদ্রা ও ঐচ্ছিক মুদ্রার প্রচলন গতি M ও M′ স্থির। কিন্তু এ অনুমান বাস্তব সম্মত নয়। কেননা V ও V′ পরিবর্তিত হলে দ্রব্যের পরিমাণ ও অর্থের প্রচলন গতি অবশ্যই পরিবর্তিত হবে।

২. এই তত্ত্ব পূর্ণ নিয়োগস্তর অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পূর্ণনিয়োগস্তর কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

৩. এই তত্ত্বে সাধারণ দামস্তর বিবেচনা করা হয়েছে। বাজারে বিদ্যমান পাইকারী খুচরা নানা মূল্যকে বিবেচনা করা হয়নি।

৪. এই তত্ত্বে কেবলমাত্র লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা হয় বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু অর্থের চাহিদা সতর্কতামূলক ও ফটকা উদ্দেশ্যে হয়। তা এ তত্ত্বে বিবেচনা করা হয় নি।

৫. অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হলে কোন প্রক্রিয়ার দামস্তর পরিবর্তিত হবে তা আলোচিত হয় নি।

৬. অর্থের পরিমাণের পরিবর্তন ছাড়াও দামের পরিবর্তন হয়। যেমন- অর্থের পরিমাণ স্থির থেকে মজুরী বৃদ্ধি, পরোক্ষ কর হার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেও দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় এ তত্ত্বের কার্যকারিতা সীমিত হয়ে পড়ে।

৭. এই তত্ত্বে অর্থের চাহিদার চেয়ে যোগানের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৮. অর্থনীতিতে মন্দাভাব বিরাজ করলে অর্থের পরিমাণ বাড়ালেও দামস্তর তেমন বাড়ে না, আবার তেজীভাব দেখা দিলে অর্থের পরিমাণ কমলেও দামস্তর কমে না। এমতাবস্থায় ফিশারের তত্ত্বটি তার কার্যকারীতা হারায়।

৯. শুধু অর্থের পরিমাণের উপরই দামস্তর নির্ভরশীল নয়, আয়স্তর, ব্যয়স্তর, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি, বিনিয়োগ পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ের উপরও দামস্তর নির্ভর করে।

পরিশেষে বলা যায় ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নানা সমালোচনা থাকলেও তত্ত্বটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর বাড়ে এ সত্যতা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। অর্থের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে অন্যান্য তত্ত্বগুলোও সমালোচনা মুক্ত নয়।